নির্বাণ

ডঃ শেখ আলীমুজ্জামান

ফুজি পাহাড়ের কাছে আশি হ্রদ, পাশে ছোট্ট পর্যটন শহর হাকোনে। ক্ষনিক অবকাশে এসেছি। সারাদিন হ্রদের পাশে, পাহাড়ের ঢালে হাঁটাহাঁটি। টোকিওর কর্মকোলাহলের বাইরে ধীর সেলুলয়েড চিত্রের মতো সময়।শান্ত হ্রদের জলে নুড়ি কুড়োচ্ছে আমার স্ত্রী নোরিকো,আমি পায়চারি করছি পাড়ে। দূরে শিনতো মন্দির তোরণের আবছা কাঠামো, পটভূমিতে পাহাড়ী অরণ্যের বিস্তার।সব চেয়ে বড় পাহাড়টি ফুজি। শরতের হালকা কুয়াশায় মোড়া পাহাড়ী অরণ্যে পাতার রঙ এখন লাল। যতদূর চোখ যায়,শুধু লাল আর লাল আর লাল। হ্রদের পানিতে প্রতিফলিত হয়েছে সেই রক্তিম বর্ণ। প্রতিফলন নাকি পাতার লোহিত কণিকা ধুয়ে এসে পানিতে মিশেছে বোঝা যায়না। তার সাথে আকাশের নীল মিশেছে কোথাও।

যা খুঁজছো তা কি পেয়েছো? পায়চারি করতে করতে হঠাৎ প্রশ্ন করি নোরিকোকে। সে থামে না, আনমনে নুড়ি কুড়িয়ে যায়। ও জানে আমার এই বিক্ষিপ্ত পায়চারির অর্থ; গভীর ভাবে কিছু ভাবছি। অথবা উলটো করে বলা যায়, যখন গভীর ভাবে কিছু ভাববার প্রয়োজন হয় তখন আমি পায়চারি করি।

পেয়েছি। অনেকটা আনমনা উত্তর ওর। যারা খুব বেশী খোঁজে প্রাপ্তি তাদের জন্য বড় দুর্লভ, ক্ষনিক নীরবতার পর যোগ করে।

নোরিকো আমার দিকে তাকায় না, কিন্তু আমি জানি ও আমাকে দেখছে ।ভাবনাকে সে খোঁজা মনে করে। অনেক সময় ঠাট্টা করে বলে, এ আমার ভালুক পায়চারী। লোকালয় থেকে দূরে পাহাড় ঘেরা হ্রদের নির্জনতায়,ভালুকের এ কিসের অনুসন্ধান? আসন্ন শীত নিদ্রার জন্য কোন একান্ত আশ্রয়!

টোকিও থেকে হাকোনের দূরত্ব ট্রেনে দুই ঘন্টা।আসার সময় কোয়ান্টাম পদার্থ বিদ্যা ও প্রাচ্যের দর্শন এর উপর একটা বই পড়ছিলাম। মন্দিরের লাল তোরণের সাথে পাহাড়ী অরণ্যের লাল মিলেমিশে একাকার। তোরণটি ওখানে আছে নাকি ভুল দেখছি সেই সংশয়। এ ভাবে দেখা কি কোয়ান্টাম তত্ত্বে বর্ণিত বস্তুর দ্বৈততা, নাকি জেন এ বর্ণিত মায়ার দ্বৈত রূপ? মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের জাপানী ধারা্র নাম জেন। শব্দটি এসেছে চীনা শব্দ “চ্যান” থেকে যার মূলে রয়েছে সংস্কৃত শব্দ ধ্যান।ধ্যানকে বলা হয় জ্ঞান অর্জন করার প্রকৃত বাহন। সেই জ্ঞান মানুষকে মায়ামুক্ত করে। মায়া হচ্ছে বিশ্বব্রহ্মমান্ডের দ্বৈত রূপ। প্রতিটি বস্তুর মাঝেই রয়েছে দ্বৈত সত্তা। আধো অন্ধকারে দূর থেকে দেখা দড়িকে সাপ বলে ভ্রম হয়। কাছে গিয়ে ভাল করে দেখে, ওটা দড়ি প্রমাণ না করা পর্যন্ত তা সাপই রয়ে যাবে। ভাল করে না দেখে পাশ কাটিয়ে চলে গেলে, আজীবন থেকে যাবে সেই সাপ। অথবা ওটা আসলে সাপই ছিল! প্রাচ্যের দর্শনের এই মায়া, পাশ্চাত্যের দার্শনিকরা উপলব্ধি করতে পারেননি দীর্ঘ কাল। গত শতকের প্রথমার্ধে ইউরোপে কোয়ান্টাম তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেন অ্যালবার্ট আইনস্টাইন, এরভিন শ্রোডিঙ্গার, নীলস বোর, ওয়ার্নার হাইসেনবার্গ প্রমুখ। প্লাটো থেকে নিউটন পর্যন্ত পদার্থ বিদ্যার চোখে বস্তু তথা বিশ্বকে দেখার জন্য সুনির্দিষ্ট কিছু তত্ত্ব ছিল। অতিপারমাণবিক স্তরে সেই মৌলিক সূত্র অচল বলে প্রমাণিত হয়, সূচনা হয় কোয়ান্টাম পদার্থ বিদ্যার। জানা যায়, অতি পারমানবিক স্তরে বস্তু যে কণিকা দিয়ে গঠিত সেই কণিকাগুলির ক্ষেত্রে পদার্থ বিদ্যার মৌলিক সূত্র প্রযোজ্য নয়।যেমন, আলোক কনিকা ফোটন এর কথা

ধরা যাক। কোয়ান্টাম তত্ত্বে ফোটন একই সাথে বস্তু ও তরঙ্গ। তার অবস্থা এবং অবস্থান আপেক্ষিক বিধায় একই সাথে তা নির্ণয় করা অসম্ভব। কেউ যদি ফোটনকে বস্তু (কণিকা) হিসেবে দেখতে চায় তাহলে একটা নির্দিষ্ট অবস্থান থেকে কিছু নির্দিষ্ট পরীক্ষন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তা সে দেখতে পারে। আবার কেউ যদি ফোটনকে তরঙ্গ হিসেবে দেখতে চায় তাহলে ভিন্ন অবস্থান থেকে কিছু ভিন্ন পরীক্ষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তা দেখা সম্ভব। কিন্তু একই সাথে ফোটনের এই দ্বৈত সত্তা দেখা সম্ভব নয়, অতিপারমানবিক স্তরে বস্তুর স্বরূপই এমন। তিন হাজার বছর আগে প্রাচ্যের ভাববাদী দর্শনে, বস্তুর এই দ্বৈতবাদকেই প্রকারান্তে মায়া বলা হয়েছে।দড়ি নাকি সাপ তা পর্যবেক্ষক নির্ভর। ভালো করে না দেখা পর্যন্ত কোনটা সত্য বলা যাবে না আবার একই সাথে দুটোই সত্য হওয়া সম্ভব নয়! প্রাচ্যের দর্শন,বিশেষ করে বৌদ্ধ দর্শন আরো একটু এগিয়ে গিয়ে বলছে, দড়ি নাকি সাপ তা পুরোটাই নির্ভর করছে পর্যবেক্ষকের উদ্দেশ্যর উপর। পার্থিব জীবনে যার যা অন্তর্নিহিত বাসনা, তাই তার কাছে সত্য হয়ে ধরা দেবে। গৌতম বুদ্ধ দুঃখ সম্পর্কে যে চার সত্য বর্ণনা করেছেন, তার মূল এখানে। জাপানে সেই দর্শনের নাম জেন।

আধার ঘনিয়ে আসছে। দূরে মায়ার মতো শিন্তো মন্দিরের তোরণ।নোরিকোকে কটেজে ফেরার জন্য তাড়া দেই। পাহাড়ী পথের কংকরে,শিশিরের শব্দ তুলে আমরা ফিরে যেতে থাকি। পিছনে পড়ে রয় আশি হ্রদ, লাল পাতায় ঢাকা পাহাড়ী অরণ্য,শিন্তো মন্দিরের তোরণ। ফিরে তাকাইনা, জানি তাকালেও দেখা হবে না, দৃষ্টি বড় ক্ষীণ। যে ভূমিতে ধ্যানমগ্ন হয়ে মহাত্মা বুদ্ধ মায়ামুক্ত বিশ্ব ব্রহ্মান্ড অবলোকন করতে সক্ষম হয়েছিলেন, যে মাটিতে ভূমিষ্ট হয়ে মাত্র দশ প্রজন্ম আগের পূর্বপুরুষগণ সেই দর্শন আত্মায় ধারণ করতে পেরেছিলেন,সেই মৃত্তিকা জাত আমার হাতে ধরা এক আসমানি কিতাব।শৈশব থেকেই শেখানো হয়েছে, নিজ থেকে দেখার কিছু নেই, সব সত্য লেখা আছে কিতাবে। বিশ্বাস করতে হবে,আলোকিত হতে হবে।সে আলোয় দূর করতে হবে খালেছ জাহেলিয়াত। কৈশোরে তাকাই। জ্যোতির্ময় হবার জন্য আমাকে শাণিত করা হলো দেশের অন্যতম বিদ্যাপীঠ বলে পরিচিত ক্যাডেট কলেজে। সেখানেও গ্রন্থের নির্দেশ, জ্বলে ওঠ কিংবা নিভে যাও। সেখান থেকে আর এক বিদ্যাপীঠ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গন। সেখানেই শেষ নয়, সমাজের প্রত্যাশা আরো আলোর। প্রজ্জ্বলিত হতে হতে তাই কক্ষহীন দুর্নিবার উল্কার মতো এসে পড়েছি সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে, ভূ-মানচিত্রে ঈশাণ কোনের দ্বীপরাষ্ট্র এই জাপানে। শুধু আমি নই, পরিচিত অনেকেই কক্ষচ্যুত হয়ে ছিটকে পড়েছে মানচিত্রের নানা প্রান্তরে। তবু কি প্রজ্জ্বলন সমাপ্ত হলো!

বৌদ্ধ দর্শনে জীবনের প্রধান লক্ষ্য নির্বাণ লাভ (পাশ্চাত্য অভিধানে বলা হয় নির্ভানা)।নির্বাণ শব্দের আক্ষরিক অর্থ নিভে যাওয়া। এক পুণ্যার্থী একবার গৌতম বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করেছিল, নির্বাণ কি? বুদ্ধ সামনে রাখা প্রদীপ শিখা ফু দিয়ে নিভিয়ে বলেছিলেন “এতক্ষন জ্বালানী তেল দহন করে শিখাটি জ্বলছিল। নির্বাণ হচ্ছে সেই দহন থামিয়ে দেওয়া, যার ফলে শিখাটি নিভে গেল”।দহন থেমে গেলে মায়ামুক্তি ঘটে,শাশ্বত সত্য উন্মোচিত হয়। পাশ্চাত্য ভাষায় নির্বাণকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে “এনলাইটমেন্ট” হিসেবে। প্রকৃত অর্থে এনলাইটমেন্ট অর্থাৎ আলোকিত হওয়া ও নির্বাণ লাভ করা সমার্থক নয়। সম্ভবত নির্বাণ শব্দের সঠিক সমার্থক শব্দ পাশ্চাত্য গন্থে নেই। আমাদের ভুখন্ডে উদ্ভাবিত অনেক শব্দই পাশ্চাত্য গ্রন্থে নেই। যেমন ধরা যাক “ধর্ম” শব্দটি, পাশ্চাত্যে যার সমার্থক শব্দ “রিলিজিয়ন”। আমাদের ভাষায় ধর্মের অর্থ যেমন ঈশ্বর প্রেরিত রিলিজিয়ন হতে পারে, তেমনি হতে পারে মানব ধর্ম। তাছাড়া আমাদের ভাষায় বস্তুরও ধর্ম আছে, যেমন পানির ধর্ম। একুশের ভাষা আন্দোলনের অন্যতম কারণ হয়তো এটাও। যে ভাষায় ধর্ম শব্দটি সুনির্দিষ্ট অর্থ বহন করে না, একটি

ইসলামী রাষ্ট্র সে ভাষাকে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃত দিতে আপত্তি করতে পারে।

তবে বাংলাভাষা কতটা ঐতিহ্যবাহী তা লেখা রয়েছে ইতিহাসের পাতায়। বাংলাপিডিয়া সূত্রে জানা যায়, বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন চর্যাপদ এর বিষয়বস্তু ছিল বৌদ্ধ ধর্মীয় শ্লোক ও সঙ্গীত।সেই আমদের জন্য এখন বৌদ্ধ দর্শন বুঝতে পাশ্চাত্য ধ্যান ধারণার প্রয়োজন পড়ে। নির্বাণ লাভের অর্থ বুঝতে কসরত করতে হয়।অথচ আলোকিত হওয়া কথাটা আমাদের কতো পরিচিত। যদিও সেই আলোকিত হওয়ার অর্থ ক্রমেই হয়ে উঠেছে পার্থিব দহন।হৃদয়ে বাসনার অনির্বান শিখা ধারণ করে দিন কাটে আরো উজ্জল ভাবে জ্বলে ওঠার প্রতীক্ষায়।

বৌদ্ধ ধর্ম কেবলই দর্শন না ধর্ম, তা নিয়ে বিস্তর আলোচনা আছে। স্বয়ং গৌতম বুদ্ধ ঈশ্বরের অস্তিত্বকে স্বীকার করেন নি। অনন্ত স্বর্গের কথা বলেননি। ঈশ্বর প্রাপ্ত কোন গ্রন্থ দিয়ে যান নি। দুঃখ থেকে চিরমুক্তির লক্ষ্যে যাপনের যে বিধান দিয়ে গেছেন তা প্রকৃতপক্ষে জীবন ধর্ম। সেই প্রেক্ষাপটে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের একটি বড় অংশ নাস্তিক।এই জাপানে অনেকে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী নয়। অধিকাংশই সামাজিক রীতিনীতি পালন করার বাইরে,প্রচলিত অর্থে ধার্মিক নয়। তার অর্থ এই নয় যে এদের কোন ধর্ম নেই। জাপানীদের রয়েছে স্বকীয় জীবন যাপন পদ্ধতি। এই পদ্ধতিকে জাপানী ভাষায় বলা হয় “দো” যার আক্ষরিক অর্থ পথ। যেমন জুডো (জুদো)এর অর্থ নম্র পদ্ধতি, চাদো এর অর্থ চা পান করার পদ্ধতি, বুশিদো এর অর্থ সৈনিকের পদ্ধতি। এরকম আরো অনেক জীবন যাপন পদ্ধতি রয়েছে এদের। এবং এ সব পদ্ধতির মূলে রয়েছে জেন অর্থাৎ বৌদ্ধ ধর্ম।সে বিচারে জাপানীদের ধর্ম আছে বৈকি।নাস্তিকের ধর্ম থাকতে পারে। জীবনই শাশ্বত সত্য বিশ্বাস করে,তাকে যাপন করার ধর্ম। সেই ধর্ম এদের নির্বাণ লাভ করতে শিখিয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে লক্ষ লক্ষ জাপানীকে কিট পতঙ্গের মত মেরে ফেলা হলেও এদের মধ্যে পুণর্বার জ্বলে ওঠার স্ফুলিঙ্গ তেমন দেখা যায়নি বরং শান্তিময় নিবারণ পরিলক্ষিত হয়েছে অনেক বেশী। নিভে যেতে যেতে জাপানীরা উঠে গেছে উন্নতির উচ্চতম সোপানে।

আমাদের মাঝে এখনো কেন যেন বার বার জ্বলে ওঠার তাড়না বড় প্রবল। আবারো একাত্তরের মতো জ্বলে উঠতে হবে,অনেকের মুখেই শোনা যায় এই প্রত্যয়ী উচ্চারণ।এক দিকে পুজিবাদের ক্রুসেড অন্য দিকে মৌলবাদের জিহাদ, কোন পথ ধরে আবারো জ্বলে উঠবো, আমরা যেন সেই অপেক্ষায়।একটা স্বাধীন দেশে বার বার জ্বলে উঠলে সেই সর্বগ্রাসী আগুনে যে প্রাণের পতাকাটি পুড়ে ছাই হয়ে যেতে পারে তা আমরা ভেবে দেখিনা। প্রজ্জ্বলন থেকে আলাদা, জন্মভূমির মাটি থেকে উদ্ভুত নির্বাপনের একটি জীবন দর্শন যে আছে, তা আমাদের দেখা হয় না।মানব ধর্মের সেই পথ যে আসমানী কিতাবের অন্তরায় নয়, বুঝতে চেষ্টা করি না।ব্যক্তি কিংবা সমষ্টিগত পর্যায়ে আলোর সন্ধান করতে গিয়ে আমরা কেবলই দহন খুঁজে ফিরি। নির্বাণ আমাদের জন্য অপরিচিতি এক জীবন বোধ।

পথের শেষে কটেজে ফিরি। নোরিকো ভিতরে যায়।আমার কেন যেন আলোয় ফিরতে ইচ্ছা হয় না। অন্ধকার বারান্দায় বসে দূর পাহাড়ের কালো ছায়া গুলোর দিকে তাকিয়ে থাকি।ঐ পাহাড়ের ও পাশে, অনেক অনেক দূরে আর এক ভূ-খন্ডে আমার জন্ম। সেখানে সবাই খুব বেশী আলোর প্রত্যাশী।

ডঃ শেখ আলীমুজ্জামান
জাপান প্রবাসী চিকৎসক ও লেখক
sheikhaleemuzzaman@gmail.com